স্বাধীনতার সন্ধানে - নূহ.উল.আলম লেনিন

‘আরও ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের জীর্ণ যুগান্তের।’

এক যুগান্তরের শেষে নবযুগের ঊষালগ্ন। একুশ শতক এখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। নতুন শতাব্দীর নবোদিত সূর্যরশ্মি জগৎ.প্রকৃতি ও মানব.প্রকৃতিকে নতুন আবেগে জাগিয়ে তুলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ অদ্ভুত আঁধার এক। জীর্ণ যুগান্তের পরও ‘ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের।’ জগৎ.সংসারের কথা না হয় বাদ দিলাম। এই আমাদের ঘরে- বাংলাদেশে, কোথায় আলো? কোথায় মুক্তি? কোথায়, কার, কিসের স্বাধীনতা? বিজয়ের এই ডিসেম্বর মাসে ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নগুলোই ফিবছর আমাদের মনকে বিষণ করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধের পুরো বর্ষাকালটা আমাদের ছৈ তোলা নৌকোর মাঝি ছিল নবাবগঞ্জ থানার চরকরিয়া গ্রামের আমির হোসেন। ঋজু, সুঠাম দেহী এক প্রচণ্ড সাহসী যুবক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে নবাবগঞ্জ, দোহার, শ্রীনগর, সিরাজদিখান ও লৌহজং থানার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। আমরা মানে, সে সময়ের ন্যাপ.কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনীর কয়েকজন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা, আজিজুর রহমান ফকু, আবদুল জলিল, আবদুল হালিম, সিরাজুম মুনীর ও আমি প্রায়শ এক সঙ্গে থাকতাম। কারও বাড়িতে না থেকে নিরাপত্তার কারণে আমরা (সবাই এক সঙ্গে না হলেও) ২/৩ জন করে রাতের পর রাত নৌকোয় কাটাতাম। আড়িয়ল বিলের মাঝে কোনও হিজল গাছের ঝোঁপে, গ্রামের উপান্তে লোকালয় থেকে দূরে কোনও খালের বাঁকে অথবা দুরগম্য জঙ্গলে নৌকো বেঁধে আমরা ঘুমোতাম। আমরা না বললেও আমির রাত জেগে পাহারা দিতো। বলাবাহুল্য আমাদের সঙ্গে একটা দো.নলা বন্দুক ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র থাকতো না। যখন নৌকোয় করে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং তাদের অস্ত্র, রশদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হতো, আমির তখন অন্যরকম মানুষ হয়ে যেতো। তার আনন্দ, উত্তেজনা এবং গর্ব যেন ফেটে পড়তে চাইতো। তার মনে হতো সে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজটি করতে পারছে। মাঝে মাঝে সে আমাদের কাছে অস্ত্র চাইতো; সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কাতর অনুনয়.বিনয় করতো। আমরা তাকে বোঝাতাম, সে যা করছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক ছাড়া ও কাজ হয় না। আমির প্রশ্ন করতো, সে তো আর মুক্তিযোদ্ধা হতে পারলো না। আমরা তাকে আশ্বস্ত করেছি, সে.ও মুক্তিযোদ্ধা। কেবল অস্ত্র হাতে নিলেই মুক্তিযোদ্ধা হয় না। আমির মেনে নিতো। হৃষ্টচিত্তে, বিনা পারিশ্রমিকে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাই সে আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরাই তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীন হলে আমরা মুক্তি পাবো। স্বাধীনতার অর্থ তার কাছে এবং তার মতো অগণিত হত.দরিদ্র মানুষের কাছে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। একটা আবছায়া ধারণা ছিল। স্বাধীন হলে দেশটা আমাদের হবে। মোটা ভাত, মোটা কাপড় মিলবে। মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ থাকবে না। দেশের অনেক উন্নতি হবে। ছেলে.মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। থানা, পুলিশ, গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর ও বড়লোকদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ‘স্বাধীনতা ও মুক্তি’ যুগলবন্দি ওই শব্দ দু’টির ভিন্ন কোনও অর্থ.ব্যঞ্জনা তাদের জানা ছিল না।

আমরা যারা নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, যারা কিছু তত্ত্বকথা জানতাম, যারা ছিলাম আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ, তাদের কাছে বাঙালির স্বাধীন.সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেয়েও ওই শব্দ দু’টির অর্থ.ব্যঞ্জনা ছিল আরও ব্যাপক। তখন মনে হয়েছে আমাদের স্বপ্নের ঠিকানা এক, আমাদের লক্ষ্য এক এবং প্রাপ্তিও বোধ হয় একই রকম হবে। আমাদের স্বপ্ন ছিল ধর্মের বেড়া ভেঙে সকল বাঙালি এক

জাতীয়তার পতাকাতলে মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হবে। শ্রেণী, জাত.পাত, ধনী.দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। বাংলাদেশে এক ভেদ.বৈষম্যহীন সাম্যের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে; যাকে আমরা বলতাম সমাজতন্ত্র। 'মুক্তি' মানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, শোষণ.বঞ্চনা, পশ্চাৎপদতা, কূপমণ্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। মুক্তি মানে অচলায়তনের- মনের, সমাজের, ক্ষমতা.কেন্দ্রের- কপাট খুলে যাওয়া। খোলা হাওয়া বইবে সর্বত্র, আলোর নাচন পাতায় পাতায়। আর কতো কী!

আজ তেত্রিশ বছর পেরিয়ে দেখি সব হিসাব.নিকাশ যেন ভুল হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, তেত্রিশ বছর পর নয়, ব্যাপারটা ১৯৭৫ সালেই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। তবু ওই যে কথায় বলে না, 'আশায় বাঁধিনু ঘর'। আমার মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে উদ্বৃত করে বলেন, 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে, যাবার সময় হলো।' অস্তাচলগামী জীবন আমাদের। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য হতোদ্যম করে দিতে চায়। একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হয়ে গেলো। পাঠক, ক্ষমা করবেন। কৈফিয়ৎ এটুকু যে, কথাটা প্রতীকী ধরে নিলে এই যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য সকল সৎ মুক্তিযোদ্ধার, সকল দেশহিতব্রতী মানুষের।

আমরা 'সৎ মুক্তিযোদ্ধা' বলছি, ইচ্ছে করেই। সততা কেবল অর্থ, বিত্ত, নৈতিকতার প্রশ্নেই নয়, নীতি.আদর্শ ও অঙ্গীকারের প্রশ্নে। যারা কোনও না কোনওভাবে মুক্তিযুদ্ধে, বাঙালির জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেও মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য, অঙ্গীকার, আদর্শ, এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে গেছেন বা তার খেলাপ করেছেন, তাদেরকে আমরা 'সৎ মুক্তিযোদ্ধা' বলতে অপারগ। মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ভেতর দিয়ে কেবল তৃতীয় বিশ্বের রীতি মাফিক ক্ষমতার রদবদলই ঘটেনি, রদবদল ও হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত্তি। নস্যাৎ করা হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারায় প্রতিষ্ঠিত লজিক। এই কুকর্মটি সম্পন্ন করেন 'মুক্তিযোদ্ধা' জিয়াউর রহমান। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লজিক ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপরীতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লজিক অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক, ভাষা.সংস্কৃতি.ভূখণ্ড.ইতিহাস.ঐতিহ্য ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিতত্ত্বকে সংবিধান থেকে নাকচ করে দেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গায়ে পাকিস্তানের মতোই ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে প্রকারান্তরে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করেন। এর ফলে ১৯৭১ সালে ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি যেমন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, তেমনি ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার মৌলিক চরিত্র.বৈশিষ্ট্য হারায়। শুধু তা.ই নয়, জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ কনসেপ্টের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী রাজাকারদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ বানিয়ে যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনিই প্রথম রাজনীতিতে অর্থ ও পেশীশক্তির আমদানি করে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ধারার সূচনা করেন। তার এই ধারাকেই ষোলকলায় পূর্ণ করেন আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ এবং জিয়া.পত্নী খালেদা জিয়া। কোনও সৎ মুক্তিযোদ্ধা এই দেশ ও জাতি বিরোধী কাজ করতে পারে না। এরশাদ ও খালেদা জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না বটে, কিন্তু জিয়াউর রহমান?

সৎ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমাদের নৌকোর মাঝি আমির হোসেন। মুক্তিযুদ্ধের পরও দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা ছিল তার কাছে। আর ছিল আমার কাছ থেকে নেওয়া মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আমাদের সহযোদ্ধা.সখা সিরাজুম মুনীরের একটি ছবি। সিরাজুম মুনীর ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর বেতিয়ারায় পাক বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হন। আমির হোসেনই তার নৌকোয় করে গভীর রাতে

ত্রিপুরার পথে মুনীরকে বিক্রমপুরের সীমানা পার করে দিয়েছিল। তার অনেক আক্ষেপ ছিল, স্বপ্ন ছিল। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে শিবরামপুরে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে আমির হোসেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হাসান ভাই (মুক্তিযুদ্ধকালে ওই অঞ্চলে আমার ছদ্মনাম) আপনেরা তো স্বাদীন হইলেন, আমাগো স্বাদীন কই? আমি তো অখনো যুদ্ধ কইরা যাইতাছি।' আমির হোসেন দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা পতাকাটি হাতে নিয়ে চিরবিদায় নিয়েছে। নৌকোর মাঝি চলে গেছে। সেই নৌকোর মালিক, বর্তমানে প্রবীণ সৎ, নির্লোভ ও ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা কৃষক নেতা আজিজুর রহমান ফকু এখনও তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছেন। নিঃস্ব সর্বস্বান্ত পঙ্গু কৃষক কর্মী আবদুল জলিল পাদপ্রদীপের আলো থেকে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু আজিজ ভাইয়ের ছাত্র একাত্তরে কৈশোর উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা নূর আলীর ঘরে এখন স্বাধীনতা ও মুক্তি চোখ ধাঁধানো রোশনাই ছড়াচ্ছে। আমার কাছে পাশাপাশি দুই গ্রামের আবদুল জলিল (অথবা আমির হোসেন) এবং মো. নূর আলী দুই বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। আবদুল জলিল বা আমির হোসেনরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার সেই পঞ্চাশ শতাংশ- যাদের অবস্থান দারিদ্রসীমার নিচে। প্রায় একই সামাজিক অবস্থান থেকে উত্থিত নূর আলী সম্ভবত সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, মোট জাতীয় উৎপাদনে যাদের অংশ প্রায় ৩৩ শতাংশ ছুঁয়েছে। অর্থাৎ নূর আলী দেশের শীর্ষ ধনিকদের একজন। নূর আলী ও জলিলকে প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে বেছে নিলাম এই জন্য যে, অতীতে যেমন আমরা একই বাম রাজনীতির অনুসারী ছিলাম, বর্তমানেও একই রাজনীতির অনুসারী। আক্ষরিক অর্থেই ১৯৭১.এ আমরা যেমন একই নৌকোর যাত্রী ছিলাম, তেমনি ২০০১ সালে নৌকা প্রতীকে নূর আলী নির্বাচন করেছে এবং আমরা দলীয় কর্মী হিসেবে নৌকার পক্ষে ক্যানভাস করেছি।'

আমি বলতে চাচ্ছি এখনও একই নৌকোর যাত্রী এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী হলেও, আমরা আসলে দুই বিপরীত জগতের বাসিন্দা। এই বিভাজন (আর্থ.সামাজিক) বড়ো সবগুলো দলেই বিদ্যমান।

বস্তুত এক বাংলাদেশের ভেতরে এখন অনেক বাংলাদেশ। কারাগারের মতো। জিয়ার শাসনামলে প্রথম রাজ.অতিথি হওয়ার সুবাদে আবিস্কার করি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরেই উঁচু উঁচু পাঁচিল ঘেরা আরও অনেক জেলখানা। রাজনৈতিক, সামাজিক মর্যাদা, শাস্তির প্রকারভেদ ইত্যাদি বিবেচনা করে কারা কোন খাতায় বা জেলের ভেতরের জেলে থাকবেন তা ঠিক করা হয়। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষও কার্যত একই ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়েও আর্থ.সামাজিক শ্রেণী ও ধর্মীয় অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন বাংলাদেশে বাস করছেন। উৎকট হয়ে উঠেছে ধন.বৈষম্য। শতকোটি টাকার বিত্ত.বৈভবের মালিক কয়েক শত পরিবারের পাশাপাশি ভোগ.লিপ্সু ও ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন প্রবল এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দু'টি সরল রেখা টেনে বাংলাদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে বটে। কিন্তু তা হবে অতি সরলীকরণ। বিকাশশীল অপরিণত পুঁজিবাদের কারণে সমাজের স্তর.বিভাজন এবং শ্রেণী.বিন্যাস এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বাস্তবে এক সর্বব্যাপী আদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভাঙা.গড়ার মধ্য দিয়ে চলছে বাংলাদেশ। বাজার অর্থনীতির প্রবল জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে সাবেকী সকল মহৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। অনুষঙ্গ হিসেবে প্রবলতর হয়ে উঠছে বাজার রাজনীতি। বাজার অর্থনীতি ও বাজার রাজনীতির কাছে দেশ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, মানবিকতা, সাম্য ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোনও স্থায়ী মূল্য নেই। অর্থনৈতিক লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার স্বার্থে যখন যে অস্ত্র, যে উপায় প্রয়োজন তা.ই ব্যবহার করাই এখানকার বিধান। রাজনীতিতে আদর্শবাদ, সততা, ত্যাগ ও অঙ্গীকারের দৃঢ়তা নিষ্প্রয়োজন। কখনও বা বাধা। সব কিছু পণ্যে রূপান্তরিত। টাকা থাকলে সব কিছু কেনা যায়। এ জন্য অর্থই মুখ্য। সেই সঙ্গে পেশীশক্তি।

এই সংক্রামক সিনড্রমে কম.বেশি সবাই আক্রান্ত, বিশ্বায়নের যুগে এই সিনড্রম হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য।

স্বাধীনতার অর্থ গেছে বদলে। একেক জনের কাছে একেক অর্থ। ক্ষমতাবানরা মনে করে যথেচ্ছভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের নির্বাধ সুযোগই হচ্ছে স্বাধীনতা। অতি সংখ্যালঘু একটি লুটেরা ধনীক শ্রেণী মনে করে রাষ্ট্রীয় অর্থের বাধাহীন লুণ্ঠনের নাম স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে না দেওয়া, প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ, জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কমিশন ভোগ এবং বিদেশে অর্থ পাচার। রাষ্ট্র নিজে এই স্বাধীনতা মেনে নিয়েছে। রাষ্ট্র বলছে কোনও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে এবং অথবা নামকাওয়াস্তে ট্যাক্স দিলে যে কোনও অংকের অবৈধ টাকাকে বৈধ করা যাবে। রাষ্ট্র অর্থের অর্থাৎ কালো টাকার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা মানে যে কেউ, সে যতো বড়ো অপরাধীই হোক অথবা রাষ্ট্র.বিরোধী (বাংলাদেশের স্বাধীনতা.বিরোধী) হোক, নির্বাচনে দাঁড়াতে, সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হতে পারবে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যা খুশি বলা যাবে, মুক্তিযুদ্ধকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে। যাকে খুশি খুন করা যাবে, বিচার হবে না। খুনের হাত থেকে রাষ্ট্র দায়মুক্তি দেবে নয়তো বলে দেবে ক্রসফায়ারে অথবা হার্ট.অ্যাটাকে মারা গেছে। রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসী উভয় পক্ষই যেন সমান স্বাধীন। কুছ পরোয়া নেই। আর রাজনীতিকদের, প্রশাসনের, বিচারকদের, ব্যবসায়ীদের, শিক্ষক, ডাক্তার বা পেশাজীবীদের কারোই জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে কোনও রকম দায়বদ্ধতা না থাকার অর্থই মুক্তি। দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি! মাৎস্যন্যায় হচ্ছে স্বাধীনতা।

তেত্রিশ বছর আগে যে স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লাখ শহীদ রক্ত দিয়েছে, সেই স্বাধীনতা কোনও এক মহাজাগতিক কৃষ্ণগহবরে হারিয়ে গেছে। ক্ষ্যাপা তাই স্বাধীনতা খুঁজে ফেরে। মঙ্গা.পীড়িত গ্রাম জনপদের বুভুক্ষু মানুষের কাছে ক্ষ্যাপা গিয়েছিল স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণের খোঁজে। মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীর প্রতীকের গ্রামের চোখ কোটরাগত হাড্ডিসার মানুষেরা বলেছে ‘কোনঠে স্বাধীনতা বাহে?’ স্বাধীনতা কী? কার স্বাধীনতা?

নূহ.উল.আলম লেনিন: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।